



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 368 - 375

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাস ‘পিয়াসহরণ’ : প্লট নির্মাণ কৌশল

রুমকি প্রামাণিক

গবেষিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: rumkipramanick018@gmail.com

 0009-0003-6648-9136

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Anil Ghorai,
Novel, Plot,
Piyasharan,
Marginal
people.

Abstract

Anil ghorai, the author of Marginal People, has depicted the stories of working people in his novel ‘piyasharan’. The novel has a total of nine chapters. Each chapter has a different story and character. The chapters have different sections. The male and female characters in the novel associated with work such as pulling rickshaws, selling flowers and leaves, housemaid, selling brooms, etc. They have to face various forms of discrimination, endure harassment at work, and face many hardships. Their personal lives, love, and other topics are featured in the novel. None of them gave up in the battle of life. The stories show that they wanted to find their own sky despite a hundred hardships. Each story in the novel is neutral and self-contained. No story complements another, yet they are part of the same novel. An underlying deep similarity has given coherence to the stories. This paper discusses the type of plot the novelist uses in this novel and how he has written the story.

Discussion

বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে বিশ শতকের নতুন দিগন্ত হলেন অনিল ঘড়াই। তাঁর উপন্যাসের মূল ভিত্তি দলিত-প্রান্তিক-নিম্নবর্গশ্রেণির মানুষ। তাঁদের জনজীবনের কথা তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই তাঁর সাহিত্যজীবনে যে কয়টি উপন্যাস রচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল ‘পিয়াসহরণ’। ২০১৪ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নর-নারী চরিত্রগুলি সকলেই দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। তাঁরা আউট হাউস বা বস্তিতে বাস করেন। তাঁরা কেউ জীবনযুদ্ধে হার মানেন না। এই উপন্যাস একটি বাস্তবধর্মী গবেষণামূলক উপন্যাস। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এই উপন্যাসের প্লট বিশ্লেষণ করা।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর ‘উপন্যাসে জীবন ও শিল্প’ বইতে বলেছেন, –

“পাঠকের কৌতুহলকে বাড়িয়ে দিয়ে প্লট সে কৌতুহলকে এক বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সেই দিক থেকে প্লট হলো কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে এক ধরনের পূর্বচিন্তা। উপন্যাসের কাহিনীতে এই পূর্বচিন্তা সুকৌশলে আরোপিত হয়ে সমস্ত ঘটনাগুলিকে পারস্পরিক যোগসূত্রে নিবদ্ধ করে একটি গ্রন্থিবদ্ধ সামগ্রিকতার আভাস দেয়।”

কাহিনীকে উপন্যাসের উপযোগী করে তুলবার জন্য পারস্পর্য অনুসরণ করার নামই প্লট নির্মাণ। গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্লটকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় – ১. সরল বা simple plot, ২. জটিল বা complex plot এবং ৩. যৌগিক বা compound plot. সরল বৃত্তে একটিই কাহিনী থাকে। জটিল বৃত্তে মূল কাহিনী থাকলেও বেশকিছু উপকাহিনী থাকে, যা মূল কাহিনীকে আকর্ষণীয় ও জটিল করে তোলে ও মূলকাহিনীর পরিপূরক হয়ে থাকে। যৌগিক প্লট সম্বলিত উপন্যাসে কাহিনী থাকে একাধিক কিন্তু কাহিনীগুলি নিরপেক্ষ হয়, একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয় না। বিভিন্ন কাহিনী এক পরোক্ষ সংযোগে গাঁথা থাকে। হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্য প্রকরণ’ বইতে বলেছেন, –

“আসলে বৃত্তের গঠন যেমনই হোক না কেন, উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব এক জীবনদর্শন ও জীবনভাবনা থাকে, উপন্যাসে সেটাই তিনি প্রকাশ করতে চান।”^২

অনিল ঘড়াই তাঁর ‘পিয়াসহরণ’ উপন্যাসটিতে কোন শ্রেণির প্লট গঠন করেছেন এবার আমরা সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

আলোচ্য উপন্যাসে রয়েছে নয়টি অধ্যায় (অনির্দেশিত)। প্রতিটি অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘পিয়াসহরণ’। এর দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে (অলিখিত)। এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে কুষ্ঠরোগী ভরতকে কেন্দ্র করে। ঔপন্যাসিক এই অধ্যায়ে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত মানুষদের সমাজের কুসংস্কারের ফলে কত যে শারীরিক মানসিক নিগ্রহের স্বীকার হতে হয় সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছেন।

রিকশাচালক ভরত ও তাঁর স্ত্রী মনসার সুখের সংসার ছিল। মনসার অসুখের সময় ঘড়ি, বাসনপত্র, আংটি, শখের সাইকেল বেচে সে তাঁর চিকিৎসা করেছিল। কিন্তু একসময় ভরতের শরীরে কুষ্ঠ রোগ বাসা বাঁধলে মনসা তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখা শুরু করে। পরিবার, গ্রাম সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে চন্দ্রধরপুরের কুষ্ঠ কলোনিতে চলে আসে। পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য সে শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। এই কলোনিতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কুষ্ঠরোগী তিলকার। সেও রোগের কারণে স্বামী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এখানে চলে এসেছে বাঁকুড়া থেকে। একসময় তাঁদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু’জন দু’জনকে সঙ্গী করে জীবন অতিবাহিত করতে চায়।

এরপরেও মায়ার টানে একদিন রাতে ভরত মনসার কাছে গেলে সে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পর হিমু মাস্টারকে খুনের দায়ে ছেলে সুশীল জেলে গেলে তাকে ছাড়ানোর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। তখন মনসা ভরতের কাছে এসে তাঁকে দলিলে সই করে দিতে বলে। ভরতও সই করে দেয়। এরপর মনসা ফিরে যেতে গেলে ভরত তাঁর পিছু নেয় না কিন্তু তিলকা তাঁর কাছে গিয়ে সততার সঙ্গে বলে, –

“আমাদের ঘর ভেঙে গিয়ে আবার জোড়া লেগেচে। আমরা আবার নতুন সংসার পেতেছি।”^৩

এভাবেই ভরত ও তিলকা একে অপরের জীবনে বাঁচার অবলম্বন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘রাধা’। কাজের মেয়ে রাধা চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যাঁরা অন্যের বাড়িতে গৃহ-পরিচারিকার কাজ করে সংসারের হাল ধরার জন্য তাঁদের কথাকে তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ে আটটি পরিচ্ছেদ বিভাগ রয়েছে (অলিখিত)।

রাধার পিতা বনমালী পেটের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে লোকের বাড়িতে মুনিষ খাটতে অপারগ হয়ে যায়। সংসারে দেখা দেয় অভাব। সংসারের হাল ধরার জন্য রাধার মা বাসন্তী রাধাকে হরির সঙ্গে ঝিয়ের কাজে চোরপালিয়া থেকে খড়গপুর শহরে পাঠিয়ে দেয়। হরি রাধাকে স্কুলশিক্ষক সুকুমার বাবুর বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেয় মাসিক তিনশো টাকায়। কিন্তু সুকুমার বাবুর স্ত্রী ইরা একজন উগ্রস্বভাব, অহংকারী ও নিষ্ঠুর মহিলা। সে রাধার উপর নানারকম হুকুম জারি করতে থাকে। ইরার ছেলে বিল্টুর দেখাশোনা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ সে একা করে তবু তাঁদের মন জয় করতে পারে না। সাতদিন পরেও রাধা এখানে মন বসাতে পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় ওঁরা সেজেগুজে বেরিয়ে গেলে রাধা একটা চিঠি লিখে নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

এরপর সে হরিকাকার বাসায় ওঠে। সেখান থেকে পরিবারের কথা ভেবে সে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কাজে যুক্ত হয়। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর নাম রুনা। তাঁরা অত্যন্ত মানবিক। খাওয়া-দাওয়া, টাকা-পয়সার ব্যাপারে তাঁরা উদার। একমাস হতেই ডাক্তারবাবু রাধাকে তিনশো টাকা দিয়ে দেন। রাধা সেই টাকা বাড়িতে পৌঁছে দেয়, -

“কোনোদিন যে বাবার কাছে টাকা পাঠাতে পারবে-এমনটা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। স্বপ্ন পূরণ হতেই রাধার চোখে-মুখে খুশি আর ধরে না।”^৪

মারুতির ড্রাইভার রতনের সাথে রাধার আলাপ হয়। রতন রাধাকে পছন্দ করে। হাসপাতালের গেটের কাছে সে রতনকে দেখতে পায়। রতনের চোখে যেন রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে প্রেম। তখন সে হরিকাকার ভাইঝি মমতার দুঃখের গভীরতা বুঝতে পারে। সে ভাবে, মমতার নাম মমতা না হয়ে রাধা হলেই ভালো হত।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম ‘উৎস-ভূমির গান’। অধ্যায়টিতে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। দুই নারীর দুই কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অধ্যায়। তাঁরা হল কাবেরী ও মাধুরী। কাবেরীর স্বামী দিগম্বর, শাশুড়ি যোগমায়া এবং তিন মেয়ে বুমুর, নূপুর ও তোড়া। তিনমেয়েকে প্রচণ্ড শাসনে রাখে কাবেরী। স্বামী দিগম্বর ভ্যান রিকশা চালিয়ে তাঁর হাতে টাকা তুলে দিত। কিন্তু হঠাৎ কার কুনজরে সে নেশা করতে শুরু করে, মেয়েদের সামনে খিস্তি খেঁড় করে। শাশুড়ি যোগমায়া তাতে ইন্ধন জোগায়। দিগম্বর একসময় মাছওয়ালি অতসীকে নিয়ে পালায়। বছরখানেক সে ভাঙা রিকশা চালিয়ে পা ভেঙে পড়ে আছে, অতসীর কামায় খায়।

এদিকে কাবেরী তিন মেয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। বড়মেয়ে বুমুরের ভালো ঘরে বিয়ে দেয়, ছোটমেয়ে তোড়াকে পড়াশোনা শেখায়। মেজমেয়ে নূপুরকে শ্যামমোড়লের ছেলে কানাই গর্ভবতী করে গ্রাম ছেড়ে পালায়। কাবেরী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শ্যামমোড়লের থেকে টাকা নিয়ে শহরের নার্সিংহোম থেকে নূপুরের গর্ভপাত করিয়ে আনে, -

“শহরের নার্সিংহোমে গর্ভপাত করিয়ে গ্রামে ফিরে এল নূপুর। যোগমায়া আর একটু হলে টের পেয়ে যেত সব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে কিছু বুঝতে পারেনি।”^৫

এরপর সে ছ’মাসের মধ্যে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক রতনের সঙ্গে নূপুরের বিয়ে দেয়। কন্যাদানের সময় সে নিজেই সম্প্রদান করে। এই কাবেরীই আবার স্বামীর হাসপাতালে ভর্তির খবর পেয়ে সময় নষ্ট না করে ছুটে যায়। যাওয়ার সময় স্বামীর দেওয়া গয়নাগুলো নিয়ে যায় ওষুধ কেনার জন্য।

আলোচ্য অধ্যায়ের অপর এক কাহিনী গ্রামের পয়সাওয়ালা ব্যক্তি কুন্ডুবাবুর পুত্রবধূ মাধুরীর। তাঁর স্বামী পবিত্র রাজস্থানের উদয়পুরে মিলিটারিতে কাজ করে। কুন্ডুবাবু মাধুরীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চান। ছেলের সাথে বউমাকে কথা বলতে দেন না। তাঁর বাজারে যাওয়া, মন্দিরে যাওয়া, কারও সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। একদিন কাজের মাসি মন্টুর মায়ের হাত দিয়ে মাধুরী পঞ্চগয়েত প্রধানের কাছে চিঠি পাঠায়। পঞ্চগয়েত অফিসের লোকজন এসে কুন্ডুবাবুর মিষ্টি কথায় ভুলে প্রসন্ন চিত্তে ফিরে যান। রাতভর মাধুরীকে কুন্ডুবাবুর লাথি-থাপ্পড় খেয়ে পড়ে থাকতে হয়। একদিন রাতে কুন্ডুবাবু তাঁর উপর ধুতি খুলে চড়ে বসলে সে তাঁর নিম্নভাগে সজোরে লাথি কষিয়ে দেয় ও হাঁটুতে শাবল দিয়ে আঘাত করে, -

“শাবলের আঘাতে হাঁটুর চাকতি এবং হাড় চূনাপাথরের ঢেলার মতো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত দুটো পা-ই বাদ দিতে হবে তাঁর।”^৬

মাধুরীর এমন আচরণ আমাদের মনে স্বস্তি দেয়।

চতুর্থ অধ্যায় ‘ধর্মের কল’। এখানে চারটি পর্ব বিভাগ রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। অনিল ঘড়াই গৃহপরিচারিকাদের জীবনের সমস্যা-সংকটকে টুরী, সরলা, কাজল, তারামনি চরিত্রগুলির মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মুক্তিবালা স্বামীর অত্যাচারে কুরী-টুরীকে নিয়ে সংসার পরিত্যাগ করে চলে আসে পিতা মহাদেবের কাছে। এরপর গ্রাম্যপিসি সরলার সাহায্যে কলকাতার চিনাকুঠিতে ষাট টাকার বিনিময়ে পরিচারিকার কাজে যুক্ত হয়। এখানেই তাঁর হাবলুর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বিবাহ হয়।

এরপর মুক্তিবালা টুরীকে চিনাকুঠিতে কাজে পাঠায়। কলকাতায় এসে টুরীর একদম ভালো লাগে না। পালিয়ে যেতে মন চায়। এখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় আর এক কাজের মেয়ে কাজলের। সেই তাকে ভেঙে পড়তে মানা করে। বাবুদের কামুক দৃষ্টি রয়েছে কাজলের উপর, –

“ওখানকার মানুষগুলো তার বুকের দিকে ধার চাকু ছুড়ে দেওয়ার মতো তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে বুনো ভাবনা।”^৬

সরলার জীবনও দুঃখে ভরা। বিয়ের দু’বছরের মধ্যে তাঁর স্বামী মারা গেলে সে পিতার কাছে চলে আসে। সেখান থেকে পেটে ভাত জোগানোর প্রয়োজনে চিনাকুঠিতে কাজে আসে। এখানে লাটু সিং-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময় সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এরপর সে জানতে পারে লাটু সিং বিবাহিত। একসময় সে পেটের পাপ নষ্ট করার জন্য টাকার বিনিময়ে টুরীকে পিতা সুবলের হাতে তুলে দেয়। সুবল টুরীকে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দিলে সে বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। অন্যদিকে সরলা অনেক আশা নিয়ে লাটু সিং-এর কাছে গেলে সে তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এরপর সরলা ভোরবেলায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে টুরী এসে তাঁকে ধরে ফেলে। যে টুরীকে সে লম্পট বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল সেই আবার তাঁকে বাঁচার পথ দেখায়।

চিনাকুঠির আর এক ঝি-এর নাম তারামনি। যে কাজের মেয়েদের মাথার মনি। বাবা নিধুরাম দু-চার টাকা হাতে পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মাসে তাঁর কাছে আসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পিতাকে টাকা দেয়। রাস্তার ধারের পানদোকানির সাথে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক। পানদোকানির বাবা প্রথমে তাঁদের সম্পর্ক মেনে না নিলেও ভালবাসার কাছে তাঁর জেদ হার মানে। তাঁদের বিবাহ হয় শেষপর্যন্ত।

আর এদিকে একবাবু কাজলের গায়ে হাত দেয়, লুটেপুটে খেতে চায় তার যৌবন। সে ঐ বাবুর মুখে সজোরে থাপ্পড় মারে ফলে তার বাসন মাজার চাকরি চলে যায়। সে গন্তব্যহীন পথে পা বাড়ায়। রাস্তায় পানদোকানির অর্থাৎ তারামনির স্বামীর সাথে তার দেখা হয়। সে তাকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেয়।

পরবর্তী অধ্যায়ের নাম ‘মুক্তির স্বাদ’। এই অধ্যায়টিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে এগারোটি পর্ব রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে উঠে এসেছে বাবুলালের পরিবারের কথা। তাঁর স্ত্রী ভগবতী এবং তিনমেয়ে পদ্ম, টগর আর জবা ও ছেলে নগেন। বাবুলাল একজন কামচোর মানুষ। সেজন্য সে ভগবতীর কাছে কথাও শোনে। স্ত্রী ভগবতী অন্যের বাড়িতে মুড়ি ভেজে, চিড়ে কুটে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলেছে। বর্তমানে ছেলে নগেন পরিমলের মাইকের দোকানে কাজ না করলে উপোস থাকতে হয় গোটা পরিবারকে।

নগেনের স্বপ্ন আয়ে যখন সংসারে অভাব দূর হয় না তখন একসময় বাবুলাল ভগবতীর কথা মতো গয়না বন্দক রেখে মাছ ব্যবসায় নেমে পড়ে। কিন্তু শুটকি মাছের দালাল কেতো বাবুলালের এই মাছের ব্যবসা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। সে তাঁর অনিষ্ট করার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় টগর ও হরিয়া গল্প করছিল নির্জন ঘরে। তখন সে ঘরের শিকল তুলে দেয় এবং গ্রামবাসীদের ডেকে আনে। শেষপর্যন্ত বাবুলালকে গলায় গামছা দিয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। এতকিছুর পরেও বাবুলাল হেরে যায়নি। সে দিঘা থেকে মাছ কিনে এনে অন্য বাজারে বিক্রি করে সংসারের হাল ধরে।

এই ঘটনার পর টগর তার দিদির বাড়ি যায়। সেখানে জামাইবাবু বাসুদেব তাকে ধর্ষণ করে। সে গর্ভবতী হয়ে গ্রামে ফিরে এসে হরিয়ার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে।

এই কাহিনীর পাশাপাশি বাবুলালের বন্ধু বাদলা ও তাঁর স্ত্রী আদুরীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। বাবুলাল ও বাদলা একসঙ্গে তাড়ি খায়। বাদলার স্ত্রী আদুরী সে দৃশ্য দেখে গলা সপ্তমে তুলে চোঁচায়। একসময় জগন্নাথের সাথে স্ত্রী আদুরী পালিয়ে যায় ছেলে পাগলা কে সাথে নিয়ে। এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই বাদলা অসুখে পড়ে। হরিয়া

তাকে সদরে নিয়ে গিয়ে টাকা পয়সা জোগাড় করে অপারেশন করিয়ে আনে। আর এদিকে জগন্নাথ আদুরীকে নিয়ে গিয়ে যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয়। পরে আদুরী নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাদলার কাছে ফিরে এলে সে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

এই অধ্যায়ে বনমালীর বউ যমুনার যাপিত জীবনের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। তাঁর শরীরের সবখানে অভাবের ছোঁয়া, বয়সের ভারে ন্যুজ দেহ। সে শুখাহাটে ঝাঁটা বেচে। মেয়েটার বিয়ে হয়েছে সদরে, জামাই হাসপাতালের ঝাড়ুদার। ছেলে হরিয়া পার্টি-পলিটিক্স করে। লুকিয়ে চুরিয়ে পাতা কাটতে ভয় করলেও যমুনা পাতা কাটে। ফি হাটে দুটো ঝাঁটার দাম তাকে খাজনাদারদের দিতে হয়। না হলে তারা তাকে হাটে বসতে দেয় না। যমুনার কষ্টের শেষ নেই। যমুনার ছেলে হরিয়া গ্রামের অভাবী দুঃখী মানুষদের সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাঁর এ কাজ মাখনবাবু এবং কেতো মেনে নিতে পারে না তাই মাখনবাবু যমুনার পাতা কাটা, গ্রামের হাটে ঝাঁটা বিক্রি, সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন। এক সময় কেতো হরিয়াকে চুরি কেসে ফাঁসিয়ে দেয়। যমুনা চারদিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিন পাতা কাটতে গিয়ে তেষ্ঠায় বুক ফেটে মুখের কোয়াশে রক্ত উঠে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তী অধ্যায় ‘নদী ও মানুষ’। চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এই অধ্যায়ে। ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই এই অধ্যায়ে চম্পা, চৈতন্য, বুধন, সুধন্য, মতিয়া, ডমন মাঝি, বিমলা, সুখিয়া দারোওয়ালি চরিত্রগুলির মাধ্যমে রেল কলোনির পাশে বসতিতে বসবাসকারী মানুষদের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন।

চৈতন্য ও তাঁর স্ত্রী চম্পা ও এক ছেলে বুধন রেলওয়ে কোম্পানির আউট হাউসে বাস করে। চৈতন্য রেলের গ্যাংম্যানের কাজ করে, কিন্তু তাঁর কাজে মন বসে না। খালি কামাই করে। সে রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। ছেলে বুধনও হয়েছে অলস প্রকৃতির। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। বহু কষ্টে ক্লাস টেন অবধি পড়াশোনা করেছে সে। চম্পাকে বাধ্য হয়ে ঠিক মতো সংসার চালাতে পরের বাড়ি ঝি-এর কাজে যেতে হয়। চৈতন্য মদ খেয়ে ড্রেনে পড়ে থাকলে বস্তির ছেলেরা এসে বুধনকে খবর দিলে তার রাগ চড়ে যায়। চৈতন্যকে এ পথে আনার মূল ছিল ভীম মাহাতো। চৈতন্য মদের জন্য বাড়ির অর্ধেক জিনিস বিক্রি করে দিয়েছে। চম্পার ভাসুর আর জা সুধন্য ও লতা খুব একটা ভালো মানুষ নয়। তাঁরা চম্পার নামে বসতিতে কুৎসা ছড়িয়ে দেয়। সুধন্য তলে তলে চৈতন্যকে মদ খাওয়ার প্রেরণা দেয় এবং তাকে মদ খেতে টাকাও দেয়।

বেতনের দিন বুধন চৈতন্যকে সাইকেল করে অফিসে নিয়ে যায়, সাথে চম্পা যায়। অফিসে গিয়ে চম্পা বড়বাবুকে চৈতন্যের কাজটা বুধনকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বড়বাবু বলেন, সময় এলে তাকে খবর দেওয়া হবে। চৈতন্যকে হালকা কাজ দেওয়া হয়। দুপুরে ভাত দিতে এসে বুধন চৈতন্যকে দেখতে পায়না। অফিসে চায়নার কথায় সে জানতে পারে সুধন্য তাকে মদের ঠেকে নিয়ে গেছে। বিকেলে চৈতন্য বাড়ি ফিরলে চম্পা টানতে টানতে তাকে সুধন্যর বাড়িতে নিয়ে যায়। গিয়ে লতার কাছে অভিযোগ করে। লতা আঁশবাটি তুললে সুধন্য বিপদ বুঝে সামনে এসে পরিস্থিতি শান্ত করে।

এরপর একদিন বুধন মুরগা লড়াই দেখতে যায়। সুধন্য সেখানে যায় মোরগের পায়ে চাকু বাঁধতে। সেখানে একজন মাঝবয়সী লোক বুধনকে বারবার দেখতে থাকে। সুধন্যর কথায় জানা যায় যে লোকটার নাম ডমন মাঝি, বুধনের আসল বাবা। সে অভাবের তাড়নায় ষোলো বছর আগে এই স্থানে চৈতন্য ও চম্পার কাছে বুধনকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সুধন্য সব কথা বুধনকে জানালে সে সব শুনে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িতে ফিরে চম্পাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে সব কথা বলে।

“নদীর মতো মানুষের যাওয়া। নদী কি কোনদিন পিছু ফিরে তাকায় মানুষের মতো? হাওয়া যা পারে, নদী তা পারে না। মানুষও যে নদীর মতো।”^৭

বুধন শেষপর্যন্ত চম্পার কাছেই রয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম ‘ফুল-পাতা’। এই অধ্যায়ে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রধান চরিত্র শিবা। শিবাবা বাবা সুধাকর ও মা প্রভাতী। তাঁর বাবার ফুল-পাতার ব্যবসা ছিল। ভোরবেলায় ফুল তুলতে গিয়ে জবা গাছের নিচে থাকা খড়িশ সাপের

ছোবলে তাঁর মৃত্যু হয়। রিকশা চালক বৃন্দাবনের রিকশায় তাঁকে চাঁদমারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তারবাবু মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর শিবা সংসার চালানোর জন্য পিতার ব্যবসাতাকেই আঁকড়ে ধরে।

ভোর চারটে বাজলেই প্রভাতী তাঁকে ডেকে দেয়। একডাকে তড়াক করে উঠে পড়ে সে। তারপর সে যায় পায়খানায়, স্নান করে, মায়ের হাতের গরম চা খেয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে যায় ফুল-পাতার সংগ্রহে। এরপর সে বিভিন্ন গাছে চড়ে ফুল পাতা সংগ্রহ করে। প্রথমে গাছের পাতা নাড়িয়ে দেয় শিবা। তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঠ পিঁপড়ে কামড়ে দেয় তার থাইয়ে। বছর পাঁচেক আগে খুব জ্বলত, এখন সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। অনেক সময় বেলপাতা কাটতে উঠলে বেলগাছের কাঁটায় খোঁচা লেগে তাঁর গায়ের চামড়া উঠে যায়। তিন মাসের ভাড়া বাকি থাকায় বাড়িওয়ালা এসে তাঁর মাকে কথা শুনিতে যায়। এরকম অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেই তাঁদের দিনযাপন করতে হয়।

একদিন স্বার্থবাবুর বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে তাঁর হাত থেকে শিককাঠি পড়ে যায়। আওয়াজ পেয়ে কাজের মেয়ে লীলা চিল্লাতে থাকে। স্বার্থবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শিবাকে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। শিবার কথায় জানা যায় প্রভাতী স্বার্থবাবুর সহপাঠী। এরপর স্বার্থবাবু তাঁকে ছেড়ে দেন। শিবা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তাঁর পায়ের চেটোয় রক্ত দেখে লীলা ডেটল লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয়।

ভজনকাকার মেয়ে সুলেখা একদিন সন্ধ্যাবেলায় টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার সময় রেলপুলিয়ার কাছে তিনজন ছেলে দ্বারা ধর্ষিত হয়। এই ঘটনার পর শিবা ভজনকাকাকে নিয়ে থানায় যায় দরখাস্ত করতে। সেখানে তাঁর সাথে লীলার দেখা হয়। লীলা এসেছে তাঁর বাবা শীতলকে ছাড়াতে। পুলিশ তাঁর বাবাকে চোলাই ঠেক থেকে তুলে এনেছে। শিবা থানার ছোটবাবুকে বলে তাঁর বাবাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়।

একদিন শিবা লীলার খোঁজে আউট হাউসের পাশের বস্তিটাতে গিয়ে জানতে পারে যে লীলার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে খারাপ ধন্দায় ঢোকাতে চাইলে সে পালিয়ে আসে। এখন এর ওর বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। সত্যচরণ তাঁর মাকে নিয়ে পালিয়েছে। এখন তাঁর মা স্টেশনের কাছে বুপড়ি হোটেল চালায়।

সুলেখার খবর শুনে প্রভাতীর মন ভালো না থাকায় বৃন্দাবনের রিকশা করে শিবার সাথে সুলেখাদের বাড়ি যায়। বাড়ি ফেরার পথে শিবা সত্যচরণের হোটেলে রাতের খাবার নিতে যায়। সেখানে লীলা বৃন্দাবনের রিকশার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। লীলার কথায় শিবা জানতে পারে যে নান্টু তাঁর সঙ্গে রাতকাটাতে আসলে তাঁর বাবা তাকে তাড়িয়ে দেয়। আজ বিশুন্দা এসেছে নান্টুর হয়ে বদলা নিতে। এরপর বৃন্দাবন পাথর উঁচিয়ে তেড়ে গেলে বিশু পালায়। এরপর লীলা শিবাদের সাথে তাঁদের বস্তিতে যায় বৃন্দাবনের রিকশা চেপে। প্যাক করা খাবার নিয়ে শিবা বসে পরেশের রিকশায়। যেতে যেতে শিবার মনে হচ্ছিল, -

“জোৎস্না আলোয় ডুবে যাচ্ছিল শিবার শরীর। এই প্রথম তার মনে হলো এ পৃথিবী ফুল পাতার মতো সুন্দর। চোখের জল নদী হয়ে বইলে সেই নদীর স্রোতে অনায়াসে ভেসে যায় ফুল পাতার পোকামাকড়।”^৮

অষ্টম অধ্যায় ‘নীল মেঘের লীলা ভূমি’। এই অধ্যায়ের প্রধান চরিত্র রিকশাচালক আশু। তাঁর স্ত্রীর নাম সোমা। আশুর বাবা রেল ওয়ার্কশপের থার্ড গ্রেডের কর্মী ছিলেন। তাঁদের পরিবার ছিল সুখী ও সচ্ছল। মা অনুরাধা পরকীয়ায় মত্ত থাকার কারণে একসময় তাঁর বাবা অভিমান করে আত্মহত্যা করে। তারপর আশুকে রিকশা চালিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয়।

সোমা যেন ঘরের বউ নয়, ঝি-চাকর। অনুরাধার মাথায় খুন চড়ে গেলে সে চড়-চাপড় সোমার গায়ে লাগিয়ে দেয়। সাত চড়েও সোমার কোনো রাগ নেই। সে অনুরাধাকে এড়িয়ে চলে। আশুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছে ছয় বছর আগে।

রিকশা চালানোটাকে খুব বেশি গর্বের কাজ বলে মনে করে না আশু, অথচ রিকশা না চালিয়ে উপায় নেই। এই কাজে শুধু মেহনত নয় ঝুঁকিও আছে। অভাব দুর্দশারও কোনো সীমা নেই। এই লাইনে আসার পর আশুর মদের নেশা ধরে যায়। তাঁর বাবার চলে যাওয়াটা বুকের ভেতর ঘা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে ক্ষত থেকে শুরু হয় রক্তক্ষরণ। অনুরাধার কাছে সত্য আসে, সাইমনও আসে। সাইমনকে কাকু বললেও আশুর মনে একদলা ঘৃণা জমে আছে। আশু গুমড়ে ওঠে।

আশুর বোন আরশি তিন বছর হল শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। কল্যান তাকে তড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একদিন সে আরশিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধকে জানাই। খবর পেয়ে আশু মনের আনন্দে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে দেখে সাইমন ও অনুরোধার ঝগড়া বেঁধেছে, প্রায়দিনই হয়। বুকে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে আশু। ঝগড়ার টুকরো টুকরো কথাগুলো বিক্ষিপ্ত কাঁচের মতো ঢুকে যাচ্ছে তাঁর কানে নীল মেঘের ফাঁকে যে সামান্য আলোটুকু ছিল তা নিভে গেছে।

এই অধ্যায়ে আর এক রিকশাচালক পেন্টার জীবনকাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। পিতা কুশলবাবু হাসপাতালের কম্পাউন্ডার এবং মাতা মানসী রেল হাসপাতালের নার্স। সিস্টার ইন চার্জ সুভদ্রার প্রেমে পড়ে কুশলবাবু। মানসী তাঁদের সম্পর্কের কথা জানতে পারলে তিনি মানসীকে জোর করে শিকড়বাটা মিছরির সহযোগে খাইয়ে দেয়। তাঁর গায়ে লোহার ছাঁকা দেয়, চুলের মুঠি ধরে মারে, খেতে দেয় না। একসময় মানসী পাগল হয়ে যায়। অসুস্থ মায়ের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ায় পেন্টা।

গরিবের মেয়ে পারুলকে বিয়ে করে পেন্টা। একবছর যেতে না যেতেই নিজের মূর্তি দেখিয়ে দেয় সে। শহরে পালিয়ে আসে পেন্টা। সেই সময় জুগনু শেঠ তাঁর হাতে ধরিয়ে দেয় রিকশার হ্যান্ডেল।

পেন্টার ভালোবাসাহীন জীবনে ছায়া হয়ে এগিয়ে আসে মেনকা। মেনকার বাবা মদন মাস্টার ক্যান্সারে মারা গেলে সে গিয়ে ওঠে মামা রতনের বাড়িতে। মামা তাঁকে পতিতালয়ে বিক্রি করতে উদ্যত হলে সে পালিয়ে আসে গ্রামের বাড়িতে। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে প্রশান্ত তাঁকে বিবাহের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে, ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। সে কথা প্রশান্তকে জানালে সে মেনে নেয় না। উপরন্তু তাকে পুড়িয়ে মারার প্ল্যান করে। সে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাস ধরে রেল শহরে চলে আসে এখানে এসে তাঁর সাথে পেন্টার দেখা হয়। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবকথা জানার পর তাঁকে গর্ভের সন্তান নষ্ট না করতে বলে পেন্টা, -

“পেন্টা তাকে বোঝায়, যে এসেছে তাকে থাকতে দাও। পৃথিবীর আলো দেখাও। অকালে ঝড়িয়ে দিলে যে পাপ হবে।”^{৩৬}

শেষপর্যন্ত মেনকা হাসপাতালে গিয়ে গর্ভপাত করিয়ে আসে। এরপর সে পেন্টার ছায়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলে।

উপন্যাসের নবম এবং শেষ অধ্যায়ের নাম ‘মৎস্যকন্যার সুগন্ধ’। বাসুদেব সংসারের সব দায়-দায়িত্ব স্ত্রী লিলির কাঁধে তুলে দিয়েছে। লিলিকে দুই ছেলেমেয়ে অভি ও বুলিকে সামলাতে হয়। পরের ঘরেও তাঁকে কাজে যেতে হয়। লিলির বিয়ের সময় বাবা গুরুপদ ঠিকাদারের কাছ থেকে লোন নিয়ে একটা নতুন রিকশা কিনে দেয় বাসুদেবকে। বছর না যেতেই সে রিকশা চালাতে গিয়ে পা ভেঙে পড়ে থাকে। সংসার চালাবার জন্য হাফদামে রিকশাটা বিক্রি করে দিতে হয়। এখন সে যে রিকশা চালায় সেটা ভাড়া রিকশা।

অধ্যায়ের আর এক অন্যতম চরিত্র সুমিত্রা। তাঁর জীবনও দুঃখের। স্বামী বিমল খুন হওয়ার পর একদিন ভাসুর রমল তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে। ধস্তাধস্তিতে বিমলের সন্তান ঝরে গর্ভ থেকে। তারপর তাঁর পাড়া সম্পর্কের কাকা মন্মথ তাঁকে আশ্রয় দেয়। তাঁকে নিয়ে খড়াপুরে চলে আসে। মন্মথর ছিল মাছের ব্যবসা। বাসুদেবের সাথে সুমিত্রার পরিচয় মন্মথই একদিন করিয়ে দেয়। মন্মথ মারা যাওয়ার পর মাছের ব্যবসার ভার সুমিত্রা নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

মন্মথর কথাগুলোই বাসুদেবকে সুমিত্রার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। রিকশা চালিয়ে সময় পেলেই সে মন্মথর বাড়িতে গিয়ে হাজির হত। সুমিত্রা চা বানিয়ে দিত, বাসুদেব খেত। মাছওয়ালি সুমিত্রার মাছের বুড়ি স্টেশন থেকে রিকশা করে নিয়ে আসে সকালে বাসুদেব। যাওয়া-আসায় পরস্পরকে চেনা-জানার সুযোগ পায় তাঁরা। সুমিত্রাও বাসুদেবকে মনে মনে ভালোবাসলেও লিলির সংসারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযমে বেঁধে রাখে।

মাছওয়ালি মাসির কথা অনেকবার বাসুদেবের মুখে শুনেছে লিলি। এছাড়াও নানাজনের নানারকম কথাতে লিলির মনে তাঁদের নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় একসময়। একদিন ছেলে অভিিকে নিয়ে চাঁদমারী হাসপাতালে গেলে সেখানে বাসুদেব ও সুমিত্রাকে একসাথে দেখতে পেয়ে সে বাসুদেবের সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়। বাসুদেব কোনো তর্ক না করে সুমিত্রাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

বাসুদেবের প্রতি সুমিত্রার বিশেষ নজর বিক্রমকে ভিতরে ভিতরে হিংস্র করে তোলে। সুমিত্রার সঙ্গে বদলা নেওয়ার জন্য বাসুদেবকে অপহরণ করে বিক্রম ও তার দলবল। কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রাখে লোহা কারখানায়। লিলির সন্দেহের তির গিয়ে পড়ে সুমিত্রার উপর। সে ভাবে সুমিত্রাই বুঝি বাসুদেবকে লুকিয়ে রেখেছে। থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসে। এরপর লোহা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে পুলিশের মারের চোটে বিক্রম সব বলে দেয়। খবর পেয়ে লিলি ও সুমিত্রা ছুটে যায় থানায়, –

“লিলির ছায়ায় সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার, ওর শরীর থেকে ভেসে আসছে মৎস্যকন্যা সুগন্ধ। চোখে চোখ পড়তেই লিলি কী করবে, কী বলবে বুঝতে পারল না। ভালোবাসা তো সমুদ্র, তাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।”^{১০}

আলোচ্য উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উপন্যাসের অধ্যায়গুলির প্রতিটি কাহিনী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। কোনো কাহিনী অপর কাহিনীর ডাইমেনশন নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনীর চরিত্রগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। স্থান,কাল ও পাত্র-পাত্রীর বৈচিত্র্য নিয়ে কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়কে স্বতন্ত্র উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া চলে। খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কাহিনীগুলি এক অন্তর্নিহিত গভীর সাদৃশ্যে সংগতি লাভ করেছে। হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘উপন্যাসের রূপরীতি’ গ্রন্থে যৌগিক প্লটের উদাহরণ দিতে গিয়ে ‘মানবজমিন’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, –

“প্রত্যেকটি আখ্যানেই সাধারণভাবে নিহিত রয়েছে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা-অসচেতন ঔদাস্যে যে মানব-জমি পতিত থেকেছে, উপযুক্ত কর্ণায় তা স্বর্ণফসলের প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারতো। এই সূত্রে আখ্যানগুলির সংবদ্ধতা সমগ্র উপন্যাসকে সংহতি দান করেছে।”^{১১}

‘পিয়াসহরণ’ উপন্যাসের প্রত্যেকটি কাহিনীও প্রান্তিক মানুষের। যারা খুঁজতে চেয়েছে তাঁদের নিজস্ব আকাশ। চাতকের মতো পিপাসায় খুঁজতে চেয়েছে জীবনের অকৃত্রিম ঠিকানাকে। এই উপন্যাস মাটির আখ্যান হয়ে উঠেছে। এভাবেই কাহিনীগুলি সংহতি লাভ করেছে। সুতরাং, সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ‘পিয়াসহরণ’ কাহিনী ঐক্যের নিরিখে একটি যৌগিক প্লটে রচিত উপন্যাস।

Reference:

১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ৩৪
২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৩, পৃ. ১৯২
৩. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৫০
৪. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৮৫
৫. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৩৬
৬. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৫১
৭. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ২৯০
৮. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৩৪০
৯. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৩৭৫
১০. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৪১৬
১১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, উপন্যাসের রূপরীতি, দে’জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ৯৭